তৃতীয় সংখ্যা
ডিসেম্বর-২০১৫

ISSN: 2319-8591

পূর্ব ভারত

(PURVA BHARAT)

(মানুষ ও সংস্কৃতি)

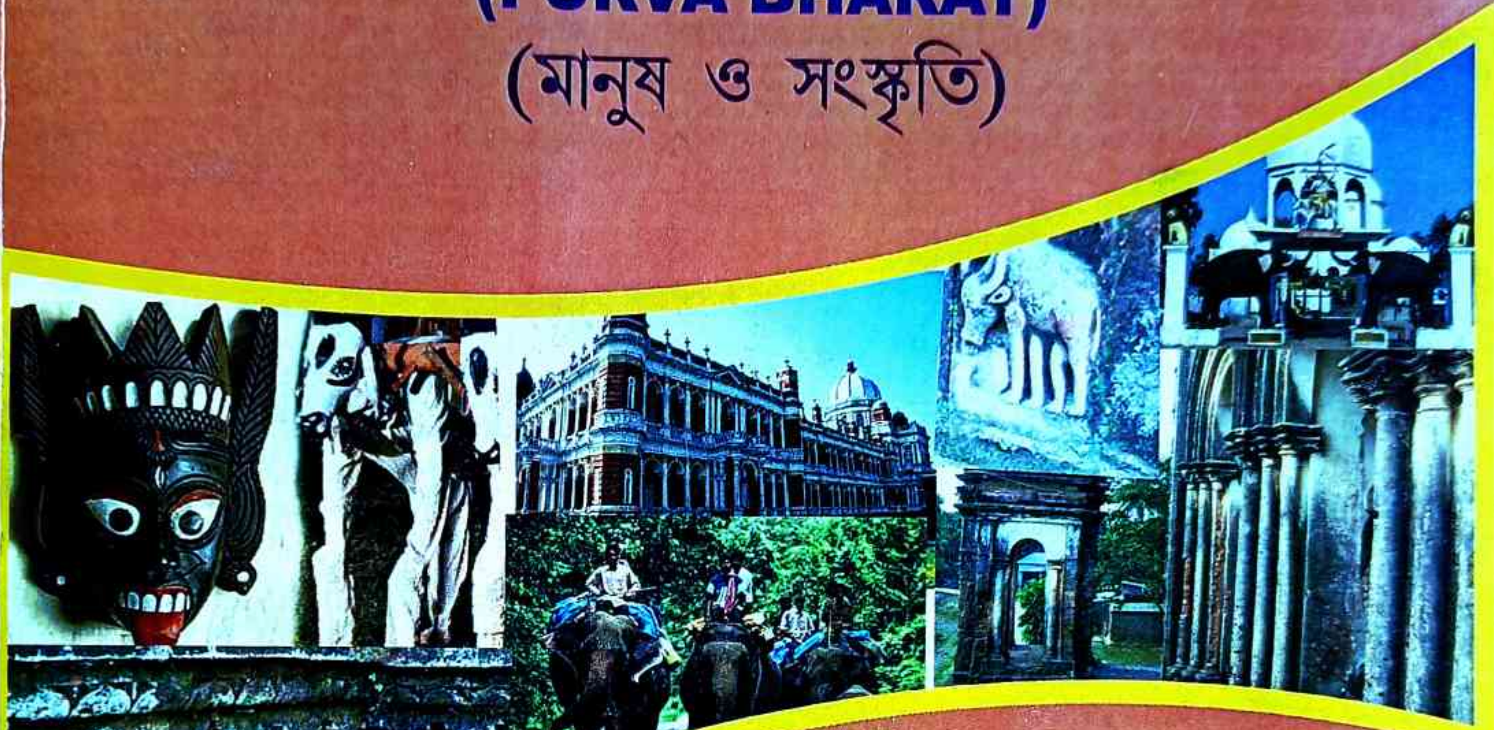

EXPLORATION
WISDOM HONESTY
EAST-INDIAN SOCIETY FOR THE STUDIES OF SOCIAL SCIENCES
2011

প্রকাশক
ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোসাল সায়েন্সেস

East Indian Society for the Studies of Social Sciences
Registration no : S/IL/79269(2011)

PURBACHAL,
2 BYE-LANE,
COURT COMPLEX,
POST- ALIPURDUAR COURT,
DIST- JALPAIGURI,
STATE- WEST BENGAL, PIN- 736122.
Contact: joydeeps447@gmail.com /raju.sujay@gmail.com

পূর্ব ভারত

মা নু ষ ও স ং স্কৃ তি

ISSN-2319-8591
চতুর্থ বর্ষ , তৃতীয় সংখ্যা , ডিসেম্বর ২০১৫

প্রধান সম্পাদক
ড. সুলেখা পন্ডিত
সহকারী সম্পাদক মন্ডলী
অধ্যাপক বিভূতিভূষণ বিশ্বাস, সুব্রত সরকার

প্রকাশক
ইস্ট ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফর দ্য স্টাডিজ অব সোশ্যাল সায়েন্সেস
গভ. রেজি. নং ঃ S/1L/79269(2011)
শোভাগঞ্জ, পো. আলিপুরদুয়ার, জেলা আলিপুরদুয়ার

সভাপতি ঃ সুব্রত সরকার
সম্পাদক ঃ সুজয় দেবনাথ
সহ সভাপতি ঃ পুষ্পজিৎ সরকার
সহ সম্পাদক ঃ জয়দীপ সিং

কোষাধ্যক্ষ ঃ জিতেন শীল

কার্যকারী সমিতির সদস্য ;
ড. অনিল সরকার, ড. সুলেখা পন্ডিত , ড. সুলেখা পন্ডিত ড. সিদ্ধার্থশঙ্কর লাহা, অধ্যাপক জয়দীপ রায়, অধ্যাপক বিভূতিভূষন বিশ্বাস, অধ্যাপক অজয় কুমার দত্ত, বিশ্বজিৎ দেব, মনোময় সেন, অধ্যাপক বাপ্পা মহন্ত

-: সুচীপত্র :-

নাম	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা
স্বাধীন ঝা	পার্টিশান পরবর্তী জলপাইগুড়ি জেলার জনবিন্যাস (১৯৪৭-১৯৭১)	৫-২২
জয়দীপ সিং	অতীত গৌরবে মালদার মন্দির	২৩-২৯
অঙ্কিতা মুখার্জী	জীবন অন্বেষার 'চতুরঙ্গ'	৩০-৩৮
দীপক কুমার বর্মন	কোচবিহারের রাজবংশী লোকচিকিৎসা ঃ বিজ্ঞান-অপবিজ্ঞানের যুগলবন্দী	৩৯-৪৮
বিষ্ণুপ্রিয়া সাহা	মূল্য- একটি সংক্ষিপ্ত দার্শনিক আলোচনা	৪৯-৫২
প্রান কুমার রজক	বর্তমান সমাজে ন্যায়বিচার	৫৩-৫৭
রাজেশ্বর রায়	বর্ধমান জেলার লৌকিক দেব-দেবী : ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে একটি পর্যবেক্ষন	৫৮-৭৮
জয়দীপ পাল	রাজ আমলে কোচবিহারের চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিহাস চর্চা (১৯১৩ - ২২)	৭৯-৮৭
সুব্রত বাড়ুই	নারী শিক্ষায় অগ্রনী নারী: প্রসঙ্গত: ঔপনিবেশিক জলপাইগুড়ি জেলা	৮৮-৯৪
সীমান্ত চৌধুরী	বাংলা পুথিসাহিত্যে কাল-জ্ঞাপক হেঁয়ালি	৯৫-১১২
জন্মেজয় রায়	বিরলতম উপজাতি : টোটো	১১৩-১১৬
কৌশিক চক্রবর্ত্তী	ডুয়ার্সে খ্রীষ্টান ধর্ম বিস্তারের সামাজিক প্রেক্ষাপট	১১৭-১৩৩
রুম্পা দাস	ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতকের কোচবিহারের সভা সাহিত্য ঃ কোচবিহার রাজ পন্ডিতগন	১৩৪-১৪৪
সুলেখা পন্ডিত	উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ঃ 'টোপ' 'জান্তব' 'বন-জ্যোৎস্না'	১৪৫-১৬১
সুজয় দেবনাথ	শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির আলোকে নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুসন্ধান	১৬২-১৮৩

সম্পাদকীয় ঃ

অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - তার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে ইতিহাস সাহিত্য ও সংস্কৃতি । কি ছিল , কি আছে , কি হতে পারে তার চর্চা , জল্পনা -কল্পনার মধ্য দিয়ে ভাবের হতে পারে তার চর্চা, জল্পনা - কল্পনার মধ্য দিয়ে ভাবের নির্মান ঘটে । প্রকৃতি দৃশ্য জগৎ, ভাব অন্তরের জগৎ - উভয়ের মেল বন্ধনেই সাহিত্যের অঙ্গীকার । মানুষই সাহিত্য ও সংস্কৃতির উদ্ভাবক, ধারক ও বাহক । নিরন্তর কালের প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি বিশেষের একান্ত উপলব্ধির সাধনা সে রেখে যেতে চায় ভাবীকালের জন্য । ইতিহাস ও সাহিত্য অতীতের পুনরুজ্জীবন ঘটায় এবং তা সমাজ বিন্যাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় । ইতিহাসের তথ্য অতীত কালের মানুষেরই সৃজনশীলতার প্রকাশ । মানুষের ধর্মই হলো ভাস্কর্য, চিত্র , সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকৃতির মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয়ে চিরকাল বেঁচে থাকা । ভলতেয়ার যথার্থই বলেছেন - অতীতের মধ্যে বর্তমান জন্মগ্রহন করে থাকে , এবং বর্তমানই ভবিষ্যতের জনক , এর পূর্বপর সম্পর্কের কখনও অন্যথা হয় না । সংস্কৃতি মানুষের আচরনীয় ক্রিয়াকর্মের শিল্পিত রূপ যার মধ্যে সাহিত্যের স্বতঃস্ফূর্ত বিকশ ঘটে । অন্তর আর বাইরের উপাদান সময়ের উদ্ভাসে সাহিত্য - সংস্কৃতি রচনা করে কালের দলিল , যা ইতিহাসে স্থান পায় ।

প্রকাশ পেল 'পূর্ব ভারত' এর তৃতীয় সংখ্যা । মানুষ-সাহিত্য-সংস্কৃতি , জীবন ও সময়ের ভাষ্যে 'পূর্বভারত' সোচ্চার । প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য ও বিচিত্র জনজাতি অধ্যুষিত পূর্বভারত ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্র । যার অধ্যুষিত পূর্বভারত ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার লীলাক্ষেত্র । যার অনেক কিছু এখনও অনুক্ত রয়ে গেছে - আমরা তাকেই বাণীবদ্ধ করার লক্ষ্যে একাগ্র । আপনাদের ভালো লাগলে , আপনাদের ভাবাতে পারলে সার্থক হবে আমাদের প্রায়াস । নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুন এই কামনায় -

ডিসেম্বর , ২০১৫

সুলেখা পন্ডিত

আলিপুরদুয়ার

পার্টিশান পরবর্তী জলপাইগুড়ি জেলার জনবিন্যাস (১৯৪৭-১৯৭১)

স্বাধীন ঝা
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
দেওয়ানহাট মহাবিদ্যালয়

''ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে ? কী লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিস্ফলতাকে বহন করতে থাকবে ।..... আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি - পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পকিকীর্ন ভগ্নস্তুপ !''

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'পরিকীর্ন ভগ্নস্তুপে'র মধ্য থেকেই ভারতবর্ষের জাতিরাষ্ট্র নির্মানের নতুন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ এর ১৫ ই অগষ্ট থেকে। জাতি রাষ্ট্র নির্মানের ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল সদ্যজাত শিশু রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করা। পার্টিশানের ফলে অখন্ড ভারতবর্ষের নাগরিকরাই নিজভূমে হয়েছিল পরবাসী। সেই সকল নাগরিকদের সুষ্ঠুভাবে ভারতরাষ্ট্রর অন্তর্গত করে তাদের নিরাপদ বসবাসের ব্যাবস্থা করাই ছিল নতুন রাষ্ট্রের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। দেশভাগের আগে থেকেই এক বিরাট সংখ্যক মানুষ পরিকল্পিত বিভাজিত এলাকা থেকে ভারতের মূল ভূখন্ডে আসতে থাকে। কিন্তু ১৯৪৭ এর পরে থেকে এই জন প্রচরনের মাত্রা নিরন্তর বাড়তে থাকে। মূলত পাঞ্জাব ও বাংলাপ্রদেশ বিভাজনের কবলে পরায় এই দুই জায়গায় জনপ্রচরনের হার ছিল অনেক বেশি। দেশভাগের পরে উদ্বাস্তু শরনাথীর আগমন নিরন্তর বাড়তে থাকলে দেশের জনবিন্যাসে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। উদ্বৃত্ত জনগনের অধিকাংশই জমায়েত হয়েছিল বড় বড় শহর গুলিতে। তবে প্রান্তিক এলাকা গুলিও এর প্রভাব থেকে অচ্ছূত ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরনার্থি প্রবাহ পার্টিশানের পরেও প্রায় দুই দশক চলেছিল। এই দীর্ঘ সময়ে জনপ্রচরনের ফলে পশ্চিমবাংলার শহর ও গ্রামঞ্চলে জনবিন্যাসে বিরাট পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। উদ্বাস্তু শরনাথীর পাশাপাশি অন্তর্দেশীয় প্রচরনের ফলেও শহর ও প্রান্তিক এলাকা গুলির জনবিন্যাসেও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছিল। স্বাধীনতার পরবতীকালে এই পরবর্তিত জনসংখ্যা এবং তার থেকে উদ্ভুত পরিস্থিতি ভারতরাষ্ট্রের পরবর্তী সমাজ - রাজনীতি ও অর্থনীতির রূপরেখা তৈরী করেছিল। সেকারনে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানী ও ইতিহাসকারদের কাছে দেশভাগ ও তার ফলে উদ্ভুত পরিস্তিতি একটি মনোগ্রাহী গবেষনার বিষয় হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাবের বিভাজন ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক চর্চা হয়েছে। সেই তুলনায় বাংলার বিভাজন ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে একাধিক চর্চা

হয়েছে । সেই তুলনায় বাংলার বিভাজন ও উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে চর্চা সেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি যদিও পাঞ্জাবের চাইতে পূর্ব ভারতের উদ্বাস্তু সমস্যা ছিল অধিক জ্বলন্ত ও নিরবিচ্ছিন্ন । বাংলায় উদ্বাস্তু সমস্যা ও উদ্বাস্তু সংক্রান্ত রাজনীতি নিয়ে জয়া চ্যাটার্জী , প্রফুল্ল চক্রবর্তী , পি এন লুথরা , রনবীর সমাদ্দার , কে বি পাকড়াশী প্রমুখ তাদের গবেষনায় সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন । এই প্রখ্যাত গবেষকরা উদ্বাস্তু আগমন ও তৎসংশ্লিষ্ট রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তার অধিকাংশই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে । কিন্তু বাংলার সামগ্রিক চিত্রের পাশাপাশি আঞ্চলিক ক্ষেত্রে উদ্বাস্তু সমস্যা ও তার পরিনামে জনবিন্যাসের পরিবর্তন ছিল ভিন্ন তর । কারন দক্ষিনবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক ব্যবধান , আঞ্চলিক বিস্তার এবং আর্থ সামাজিক ভিন্নতার জন্য এর প্রভাব ও সেখান থেকে বেড়িয়ে আসার পদ্ধতি ছিল ভিন্নতর । সেই প্রেক্ষিতেই আঞ্চলিক ক্ষেত্রে জনবিন্যাসের কিরূপ পরিবর্তন ঘটেছিল তা নিয়ে একটি আলোচনার জন্য পার্টিশান পরবর্তীকালে জলপাইগুড়ি জেলার জনবিন্যাসের চিত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এই নিবন্ধে । এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে কিভাবে পার্টিশানের পরে বিভাজিত প্রান্তিক অঞ্চল গুলিতে জনবিন্যাসের অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটেছে এবং এই পরিবর্তনের ফলে সেই এলাকা গুলির আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক ব্যাবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে ।

১৯৪৭ এর পার্টিশন ও জলপাইগুড়ি জেলার বিভাজন

১৯৪৭ সালে র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে জনপাইগুড়ি জেলাকেও ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজন করা হয়েছিল । পার্টিশানের পর জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক সীমানা হয়েছিল এরূপ - উত্তর দার্জিলিং এবং সার্বভৌম ভূটান রাজ্য ; দক্ষিনে কোচবিহার ও পূর্ব পাকিস্তানের রংপুর জেলা ; পশ্চিমে বিহারে পুর্ণিয়া জেলা ও দার্জিলিং জেলা এবং পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানের বাংলাদেশ) ; এবং পূর্বে আসামের গোয়ালপাড়া জেলা অর্থাৎ সংকোশ নদীর পূর্ব তীর ছিল জলপাইগুড়ির পূর্বসীমানা রেখা ।[১] ১৯৪৭ খ্রীঃ-র র‍্যাডক্লিফ রোয়েঁদাদ নির্ধারিত সীমানা অনুযায়ী পূর্বতন জলপাইগুড়ি জেলা থেকে পাঁচটি থানা যথাক্রমে - পাটগ্রাম , তেতুলিয়া , বোদা , পচাগড় ও দেবীগঞ্জ পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানের বাংলাদেশ) অন্তর্ভূক্ত হয় ।[২] র‍্যাডক্লিফের সীমানা অনুযায়ী যে পাঁচটি থানা জলপাইগুড়ি জেলা থেকে আলাদা হয়েছিল তার ফলে ৬৭২ বর্গ মাইল এলাকা পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয় । এর ফলে ১৪ই আগষ্ট বিভাজনের সময় জলপাইগুড়ির মোট আয়তন ৩০৫০ বর্গ মাইল থেকে কমে ২৩৭৮ বর্গমাইল হয়েছিল । শুধু ভৌগলিক পুর্নবিন্যাস নয় এই বিভাজনের ফলে বিভাজিত এলাকার গ্রামগুলিও বিভাজিত হয়েছিল এবং তার সঙ্গে এক বিরাট জনসমষ্টিরও বিভাজন হয় । সে কারনে এক ভায়াবহ জন স্থানান্তর ঘটে । পার্টিশানের পুর্বে জলপাইগুড়ি জেলা রাজশাহী

অতীত গৌরবে মালদার মন্দির

জয়দীপ সিং
সহকারী অধ্যাপক
শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ
কামাক্ষাগুড়ি , আলিপুরদুয়ার

উত্তরবঙ্গ বলে নির্দিষ্ট কোন ভৌগলিক বা প্রশাসনিক বিভাগ পশ্চিমবঙ্গে চিহ্নিত করা যায় নি । তবুও মুর্শিদাবাদে ফারাক্কায় গঙ্গার ওপারে মালদহের খেজুরিয়া ঘাট থেকে হিমালয় সংলগ্ন দার্জিলিং পর্যন্ত বিস্তীর্ন ভূখন্ডটি উত্তরবঙ্গ বলে উল্লেখ করা হয় । পূর্বে পাচটি জেলা উত্তরবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল । যথা মালদহ, দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার পরে দিনাজপুর জেলা উত্তর ও দক্ষিনে এই দুই ভাগে বিভক্ত হয় এবং জলপাইগুড়ি জেলা ভাগ হয়ে গঠিত হয় আলিপুরদুয়ার জেলা ।[১]

কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের প্রবেশ পথে প্রথম মালদা জেলা । উত্তরবঙ্গের প্রাচীন তম জেলাও মালদহ । ১৮১৩ খ্রীঃ এই জেলার জন্ম । মালদা জেলা তথা মালদহ নামটি নিয়ে অজস্র মতামত প্রচলিত আছে । এই অংশে পূর্বে মাল জাতি কর্তৃক বসবাস স্থাপন হয়েছিল বলে অনেকের অভিমত । প্লিনির প্রাচীন ভারতের ভূগোলে মাল্লি জাতির কথা উল্লেখিত আছে । অনেকের মতে মাল্লি জাতি তারাই যারা কলিঙ্গ ও গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে বসবাস করত । এছাড়াও বলা হয় এরা বিখ্যাত মন্দর পর্বতের সঙ্গে যুক্ত অধিবাসী । মাল শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ পাহাড়িয়া জাতি বা পার্বত্য জাতি । প্রায় দু হাজার বছর আগে এই দ্রাবিড়ীয় জাতি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে । বর্তমানে মালদায় মাল পাহাড়িয়াদের সংখ্যা ব্যাপক না হলেও তারা তাদের অস্তিত্ব আজও বজায় রেখেছে । মালদহ শব্দটি প্রথম আবুল ফজল আল্লামির আইন -ই-আকবরীতে দৃষ্ট হয় । সুতরাং প্রাক মুঘল যুগেই তার প্রচলন থাকা স্বাভাবিক । এমনকি তার পূর্বে থাকার সম্ভাবনাই প্রবল । আবার সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ মাল (মল+মঞ) শব্দের অর্থ উন্নত ক্ষেত্র বা উচ্চ জমি বোঝায় তার সঙ্গে আঞ্চলিক দহ যুক্ত হয়েই মালদহ হয়েছে ।[২]

কলিন্দী ও মহানন্দা নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত এখনকার পুরাতন মালদহ ছিল মধ্যযুগে বাংলার এক সমৃদ্ধশালী ব্যস্ততম বন্দর নগরী । কয়েকশ বছর যাবৎ এই জনপদটি নৌ পরিবহন ও নৌ-বানিজ্য কেন্দ্ররূপে শুধু ভারতবর্ষ কেন সারা বিশ্বের বাজারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছিল । দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহের সময় মালদহ নগরীর একাংশ সামরিক ঘাটি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল , মোঘলযুগেও মালদহ ছিল গুরুত্বপূর্ন বানিজ্যকেন্দ্র । ইংরেজবাদ বা ইংরেজবাজার নামে পরবর্তীকালের

আধুনিক মালদহ শহর পত্তনের আগে এই মালদহ ছিল দেশ বিদেশের বনিকদের সওদাগরী কেন্দ্র এবং আকর্ষন স্থল ।[৩]

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বঙ্গদেশ গৌড়বঙ্গ বা রাঢ় বঙ্গের রাজধানী হিসেবে মালদহের গৌড় -পান্ডুয়া অঞ্চলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম । গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন । বাংলা , বিহার এবং ওড়িশার বিস্তৃত অঞ্চল গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল । মূলত ইতিহাস বলে ৭৩৯ খ্রীঃ পূঃ অব্দে গৌড়ের রাজধানী স্থাপিত হয় । মধ্যযুগে গৌড়ের রাজদরবার বিশেষ করে সুলতান হোসেন শাহের আমলে যে জ্ঞানী গুনীর সমাবেশ হয়েছিল তা ইতিহাস পাঠক মাত্রই জানেন । প্রাচীন পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে গৌড়ের রাজদরবারকে কেন্দ্র করে এবং তার পৃষ্ঠপোষকতায় বঙ্গসংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছিল । একদা বঙ্গদেশের রাজধানী এবং প্রাচীন ঐতিহ্যের সূত্রে শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকে মালদহে নানা জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটেছে । রাজস্থান , বিহার , উত্তরপ্রদেশ থেকে যেমন বহুলোক এসেছে তেমনি আদি বাসিন্দাদের মধ্যে রাজবংশ কোচ , পলিয়া দেশী জনসম্প্রদায় রয়েছে । রয়েছে মুসলিম সম্প্রদায় । এছাড়া রাঢ় ও পূর্ববঙ্গের লোকজনও মিশে গিয়ে এক মিশ্র জনসমাজ নিয়ে গড়ে উঠেছে মালদহ । দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে অসংখ্য মানুষ উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত এ জেলায়ও আশ্রয় নেয় । ফলে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রনে এই মিশ্র সংস্কৃতি এই জেলায় লক্ষ্য করা যায় ।[৪]

মালদহ জেলার সীমানা বর্তমানে সে ভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যে এলাকার মাটি সুদীর্ঘকাল ব্যাপী নানান ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের নীরব সাক্ষী । নানান কর্মাবলম্বী রাজা-মহারাজা রাজত্বকরার সুবাদে তাদের রাজধানীর নাম হয়েছে রামাবতী বা লক্ষনবতী বা গৌড় বা পান্ডুয়া । এভাবে রাজধানীর নাম পাল্টালেও এলাকার বিরাট কোন পরিবর্তন ঘটে নি । এই কারনে আজ এই মালদহ জেলাতে প্রায় সব যুগেরই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কিছু না কিছু মেলে । পাল আমলে এই অঞ্চলে হয়তো কোন বিহার বা সাঙ্ঘারাম নির্মিত হয়েছিল । কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোন সঠিক নিদর্শন এ জেলাতে পাওয়া যায় নি । জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে সুপ্রাচীন কিছু স্তুপ বা ঢিপি । যেমন খরবা থানার কান্তারন , সদর থানার উত্তর পশ্চিমে পিছলী , পান্ডুয়ার সাতশছরা , বামন গোলা থানার জগদলা ও বারিন্দার উচ্চভুমি এবং এশরিয়ার ধনামনার টিলা ও রাইখান দীঘির সন্নিকটের স্তুপটি । এগুলির অন্তরালে অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ উৎখনের অপেক্ষায় আছে । মাঝে মাঝে এই উচ্চভূমি থেকে বিশেষ করে কান্তারন ও পিছলীর উচ্চভুমি থেকে এথন সব পুরাবস্তু অবিস্কৃত হয়েছে যার ফলে বহু নতুন তথ্য

জীবন অন্বেষার 'চতুরঙ্গ'

অঙ্কিতা মুখার্জী
অধ্যাপীকা
বাংলা ও সাহিত্য বিভাগ
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

অন্বেষন এষণা জাত । অন্বেষণেই অগ্রসরমান জীবন প্রবাহের গতিময় আত্মপ্রকাশ । এই এষণা জীবনকে প্রতি অনুভবে নবীনের আস্বাদ এনে দেয় । এই জীবন অন্বেষারই রঙ্গভূমি রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' (১৯১৫) । এই উপন্যাস নতুন সৃষ্টি । প্লট ও চিত্রকেন্দ্রিক তথাকথিত উপন্যাস থেকে এ একেবারে পৃথক দর্শন । এর রসোপলব্ধি প্রধানত : বুদ্ধিসাদ্ধ । রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' এর সামাজিক সমস্যা আর নীতিবোধকে ভেঙে 'চোখের বালি' (১৯০৩) - তে প্রকাশ করলেন 'আঁতের কথা' -সেখানে প্রধান হল ব্যাক্তিক সমস্যা বা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা । 'চোখের বালি' -র পর এদেশের বঙ্গভঙ্গের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ চলল, কবির জীবনেও ঘটল নানা বিপর্যয় । ১৯০২ -এ স্ত্রী মৃণালিনী দেবীকে হারানোর তিন বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় কন্যা রেনুকা , কনিষ্ঠ পুত্র সমীন্দ্রনাথ , সেই সঙ্গে পিতা দেবেন্দ্রনাথকেও হারালেন । ১৯১০ -এ 'রাজা' নাটক এবং 'বলাকা' কাব্যের সঙ্গে তাঁর 'গোরা' ও প্রকাশিত হল । গোরা তার স্বদেশকে খুজেছিল এদেশের আপামর মানুষের চেতনায় , তথাকথিত সংস্কার মুক্তির বিপরীতে । স্বজাতির খোজ এবং ব্যাক্তি থেকে সমষ্টিতে উত্তরন -এরই মিশ্রনে 'গোরা'র মূল সুর হল - 'মা তুমিই আমার ভারতবর্ষ' । এরপর কবির বিদেশ যাত্রা , শারীরিক অসুস্থ্যতা , সেই সঙ্গে গীতাঞ্জলীর কবিতাপাঠ ইত্যাদি কারনে তিনি ১৯১২ তে বিলেত গেলেন । ১৯১৩ তে কবির নোবেল জয় । ১৯১৪ তে শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ , এর মধ্যেই মানুষের চেতনা জগৎ আমূল বদলে গেল । মানবতাবাদ , হিন্দু পুনর্জাগরন , কোৎ - মিল - বেন্থামের দর্শন প্রভৃতিকে ঘিরে প্রায় এক শতাব্দীর (১৮০১-১৮৯৩, রামমোহন-বঙ্কিম- বিবেকানন্দ) দোলন হিসেবে 'চতুরঙ্গ' প্রকাশিত হতে থাকল 'সবুজপত্রে' র পাতায় । মানুষের প্রকৃত চাওয়া কি হবে - এই জিজ্ঞাসাই কবিকে এগিয়ে দিল 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে । শ্রিবিলাসের ডায়েরী আকারে আত্মপ্রকাশ করল 'চতুরঙ্গ' ।

মানুষ তার অস্তিত্বের শিকড় নামাবে কোন ভূমিতে ? সে কি তার ধ্যানলব্ধ কোন সত্যস্বরূপ না কি তার সামাজিক ও পারিবারিক সত্তার প্রাত্যহিক আবরনের মধ্যেই সে খুঁজে নেবে তার অস্তিত্বের শিকড় নামানোর জায়গা ? এই হল 'চতুরঙ্গে'র খোঁজ । বিভিন্ন জগতের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে

'চতুরঙ্গ' । উনিশ শতকের জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বিশ শতকের সূচনা এবং উনিশ ও বিশ শতকের হিন্দু পুনর্জাগরনের পর্ব ছাড়িয়ে রবীন্দ্র চেতনার বিকাশ এতে লক্ষ্যনীয় ।

দ্বৈবাঙ্কব আদলে , অভিনব গঠন কৌশলে , জ্যাঠামশায় , শচীশ 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' - এই চারটি অংশে , চরিত্র - প্লট-ইমেজ আর ডায়েরীর আদলে , চরিত্র ও ভাবনার এক দ্বান্দ্বিক বিশেষত্বে , বুদ্ধির দীপ্তি , রহস্যময় সংকেত , সূত্রায়িত বর্ণনাভঙ্গি , জ্ঞানগর্ভ ইঙ্গিতময় বিবৃতি সেই সঙ্গে সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষনের মধ্যে দিয়ে মানুষের জীবনের অন্বিষ্ট কি হবে , তা কি তত্ত্বপ্রনতা না কি প্রাত্যহিক জীবনের অন্বিষ্ট কি হবে , তা কি তত্ত্বপ্রানতা না কি প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যেই আছে সেই বেচে থাকার সারাৎসার- এই জীবনের খোজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কবির চতুরঙ্গ এ । গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর 'ডায়লগ' গ্রন্থটিতে দ্বান্দ্বিকতার এমনই এক বিন্যাস লক্ষ্যনীয় । যেখানে অনেক 'না' -এর মধ্যে দিয়ে একটি 'হ্যা' -এ পৌছেছেন প্লেটো । বৈষ্ণব দর্শনে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' ও এমনিভাবে 'এহো বাহ্য' -এর কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে 'এহোত্তম' -তে পৌছেছেন প্লেটো । বৈষ্ণব দর্শনে 'চৈতন্যচিতামৃতে' ও এমনিভাবে 'এহো বাহ্য' -এর কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে 'এহোত্তম' -তে পৌছেছি আমরা । এই ধারারই আধুনিক মুখাবয়ব নির্মিত হয়েছে 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে । এই উপন্যাসে চরিত্ররা জীবনকে প্রশ্ন করে , আর তার যাপনের উত্তরের মধ্যে দিয়েই অন্য উপলব্ধিতে পৌছায় এবং এভাবেই উপন্যাসে এগোয় ।

উপন্যাসে দেখা যায় , শচীশ ও শ্রীবিলাসের বন্ধুত্ব মুগ্ধতায় বাঁধা । শচীসকে ঘিরে কাহিনি এগোচ্ছে । প্রথম থেকে শ্রীবিলাস শচীসকে অনুসরন করে নিজের মতো বদলাচ্ছে । ক্রমশ: শচীস ম্লান হয়ে যায় , শ্রিবিলাস এগিয়ে আসে । শচীস ও শ্রীবিলাস-দামিনীর জগৎ আলাদা হয় এবং এখানেই ধরা পড়ে ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্য । উপন্যাসের শুরু 'জ্যাঠামশায়' অধ্যায় দিয়ে । শচীসের জ্যাঠামশায় নাস্তিক । জগমোহনের নাস্তিকতা ও পজিটিভিজম্ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত । জ্যাঠামশায় কোঁৎ- এর দ্বারা প্রভাবিত । কোঁৎ-এর মতে মানুষই শেষ কথা , যা পজিটিভিজমের শেষ কথা - আর তাই জ্যাঠামশায়ের ঈশ্বর হয় মুসলমান-চামারকুল । আবার জ্যাঠামশায় ম্যালথাস পড়েছেন এবং সেই অনুসরনেই বিবাহ করেনি । বেন্থামের হিতাবাদী দর্শনেই জ্যাঠমশায়ের দর্শন গড়ে উঠেছে -'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধন' । বিজ্ঞান ও যুক্তির মিলনে আধিভৌতিক চিন্তা যার থেকে নাস্তিকতার জন্ম । আর নাস্তিকতা থেকে জ্যাঠামশাই ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে , 'না ঈশ্বরে' বিশ্বাস করেন । তাঁর মত হল ''ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া ; সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে , ঈশ্বর নাই ; অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে , ঈশ্বর নাই''।

কোচবিহারের রাজবংশী লোকচিকিৎসা ঃ বিজ্ঞান-অপবিজ্ঞানের যুগলবন্দী

দীপক কুমার বর্মন
শিক্ষক
ইতিহাস বিভাগ
আলিপুরদুয়ার শান্তিদেবী উচ্চ বিদ্যালয়

প্রাচীন কামরূপ সাম্রাজ্যের শেষ নির্যাস হল কোচবিহার জেলা । এই রাজ্যের অতীত ইতিহাস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারনে যে বৃটিশ আমলের পাচঁ শতাধিক দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কোচবিহার প্রাচীনত্ব, এককথায় প্রশ্নাতীত । রাজপুতনার মুষ্টিমেয় দেশীয় রাজ্য ছাড়া ভারতের খুব অল্প দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের সমতুল্য প্রাচীনত্ব দাবী করতে পারে ।[১] পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশ অবস্থিত এই রাজ্যটিতে কোচ জাতিগোষ্ঠীর লোকজন ছাড়াও মেচ, রাভা, সাঁওতাল , মুন্ডা, গাঁরো, ওঁরাও, প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা বসবাস করেন তাদের নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতিকে কমবেশি আঁকড়ে ধরে যে সব নিজস্ব সংস্কারের উদ্ভব হয়েছিল সেই স্মরনাতীত কালে আমার আলোচ্য কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের আগমন সম্পর্কে ।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত বোড়ো ভাষী এই জনগোষ্ঠী প্রাচীনকালে দক্ষিন-পশ্চিম চীন হতে ক্রমশ ব্রহ্মদেশ , মালয় , উপদ্বীপ এবং পূর্ব-দক্ষিন সমুদ্র উপকূলীয় দেশ ও দ্বীপ গুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল । পথে উত্তর আসামে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিরি, নাগা , বোড়ো বা মেচ সম্প্রদায়ভুক্ত কোচ , পালিয়া , রাজবংশী লোকের মধ্যে একটি ধারাপ্রবাহ ঐতিহাসিক কালে বাংলাদেশ এসে ঢুকে পরে এবং রংপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি বর্তমান আলিপুরদুয়ার প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন ।[২] এই সময়কাল হল খৃষ্টপূর্ব দশম শতক । এভাবে এতদাঞ্চলে রাজবংশী সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে ।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি রাজবংশী লোকচিকিৎসার ধারাকে বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের আলোয় আলোচনা করার চেষ্টা করেছি । কোচবিহারের লোকচিকিৎসার ধারাকে বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের আলোয় আলোচনা করার চেষ্টা করেছি । কোচবিহারের লোকচিকিৎসা বিষয়ে বিভিন্ন লেখক ও গবেষকদের তাদের মুল্যবান গ্রন্থে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে আলোচনা করেছেন যেমন -ডঃ দিলিপ কুমার দে তার কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি গ্রন্থে , মাননীয় রণজিৎ দেব তাঁর রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস গ্রন্থে , গবেষক তনয় মন্ডল তাঁর রাজবংশী লোকচিকিৎসা গ্রন্থে , তথাপি রাজবংশী লকোচিকিৎসা বিষয়ে পুনরায়

আলোচনার তাগিদ অনুভব করছি একটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাসঙ্গিকতার দিক থেকে । তবে এ বিষয়ে জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করেই আলোচনার চেষ্টা করছি ।

লোকচিকিৎসা অর্থাৎ এখানে লোক শব্দটি নিছক জনগনের অর্থবোধক নয় । পরিভাষিক শব্দ লোক এর অর্থ হল মূলত গ্রামীন জনগন , যার অধিকাংশই কৃষিকেন্দ্রিক জীবিকানির্ভর জনগোষ্ঠী । গ্রামবাসীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ বিশেষ পায় না । তাই তারা পূর্বপুরুষদের নিকট থেকে উৎপাদন , যানবাহন , যন্ত্রপাতি , পোশাক-পরিচ্ছদ , খাদ্যদ্রব্য , ধর্মকর্ম, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে , তাকে অবলম্বন করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে । সরলতা , সজীবতা ও অকৃত্রিমতা লোক সমাজের মৌলিক বৈশিষ্ট্য । সেই অর্থে লোকচিকিৎসা হল এই গোষ্ঠীর যে সকল মানুষ বংশানুক্রমিক বা জুগানুক্রমিকের মাধ্যমে যে চিকিৎসা প্রনালী গড়ে তুলেছে যার ব্যাবহার বিধিশ্রাস্র মতানুসারী নয় এবং যার বিশ্বাসের মূল গভীরভাবে ইতিহাস ঐতিহ্যের সঙ্গে অত্যাস্ত ঘনিষ্ঠ ।[৩] এই লোকচিকিৎসাগত জ্ঞান পরম্পরাগতভাবে মুখে মুখে সঞ্চালিত হয় পরম্পরাগতভাবে । এর ব্যাবহারও বিভিন্নমুখী , বাস্তুতান্ত্রিক , বিশেষ করে বিভিন্ন জাতিগত সম্প্রদায়ভিত্তিক গৃহস্থ পরিবারগুলির মধ্যে লক্ষনীয় । সভ্যতার বিকাশের প্রাথমিক স্তরেই এই গোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে জগতের ঘটে চলা সব ঘটনার পেছনেই একটা কারন অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় । এবং সেই কারনকে খুজতে গিয়ে তাদের জীবনে ঘটে চলা বিভিন্ন রোগ ব্যাধির আচ অনুধাবন করতে পেরেছে । এই কারনে মন্ত্র-তন্ত্র, তুকতাক, মরন-উচাটন-বশীকরন, যাদুবিদ্যা, ইত্যাদির সুত্র ধরে লৌকিক চিকিৎসা পদ্ধতির ধারাটা প্রাথমিক পর্যায়ে গড়ে উঠলেও, আদিকাল থেকেই গাছ গাছড়া , শাক-লতা-পাতা , বাঁকল-শিকড়, জড়িবুটি, এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রাপ্ত কিছু কিছু রাসায়নিক গুনের কথা মানুষ জেনেছে এবং ব্যাবহার করেছে ।[৪] তাদের সে অপবিজ্ঞানের (Pseudo-science) বা প্রাকবিজ্ঞান যুগের আবিস্কার পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে হয়ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ার মিল নেই কিন্তু সেদিনের সেই অপবিজ্ঞানিরাই ছিলেন আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুর্বসূরি । তারাই ছিলেন তখনকার দিনের অসহায় মানুষের ত্রাতা ।

রাজবংশী লোকচিকিৎসাকে বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের মাপকাঠিতে পাল্লায় ওঠানোর পূর্বে আমাদের রাজবংশী লোকচিকিৎসার বিষয়ে একটু ধারনা দেওয়া প্রয়োজন । কোচবিহারের রাজবংশী লোক চিকিৎসার মাধ্যমগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় । যথা - প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি ও অতি-প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি । স্থানীয় গাছ গাছড়ার সাহায্যে চিকিৎসা যাকে প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে গন্য করা হয় । রাজবংশী লোকচিকিৎসায় গাছন্ত ঔষধি ব্যাবহারের প্রভাব প্রকট । (আমি ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখেছি যে গ্রামীন ৮০ % শতাংশ লোক এখনও করে চলেছেন) বা হাড়ভাঙ্গা চিকিৎসা কিংবা মাতৃত্বকালীন নিরাময় অথবা গবাদি পশুর রোগ নিরাময় এসব দিকগুলির ক্ষেত্রে রাজবংশী সমাজে অতীতের ন্যায় বর্তমানেও বহুল

মূল্য- একটি সংক্ষিপ্ত দার্শনিক আলোচনা

বিষ্ণুপ্রিয়া সাহা
গবেষিকা দর্শন বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

মূল্য বলতে সাধারনত: এমন কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বাস অথবা ধারনাকে বোঝায় যা একটি গোষ্ঠীর অর্ন্তগত প্রায় সব মানুষই ভালো কিংবা মন্দ অথবা কাম্য কিংবা ত্যাজ্য বল মনে করেন। যে সব ধারনাকে মানুষ মূল্যবান বলে মনে করে সেই ধারনার বশবর্তী হয়েই মানুষ তার জীবনকে গড়ে তুলতে চায়।তাই দেখা যায় এই ধারনা গুলি যাকে মানুষ মূল্যবান (Vauable) বলে মনে করে, তা কোন না কোন ভাবে সেই মানুষটিকে প্রভাবিত করে। প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য এই উভয় পৃথিবীতেই প্রাচীন কাল থেকে মানুষ কিছু কিছু বিশ্বাস বা ধারনাকে মূল্যবান বলে মনে করে এসেছে। তবে এখানে আলোচ্য বিষয় প্রাচীন কাল থেকে মূল্যবান বলে মনে করে আসা কোন বিশ্বাস বা ধারনা নয়, কিংবা বিভিন্ন মূল্য গুলোর মধ্যেকার পার্থক্যও নয়। এখানে এই বদলে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন সমাজসম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (Social Science)[১] গুলির মূল্য খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

আধুনিক সমাজে যেখানে মানুষ পুরোপুরি যন্ত্র নির্ভর সেখানে বিভিন্ন সমাজ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানগুলি যেন ব্রাত্য হয়ে পড়েছে। প্রাচীন কাল থেকেই যেখানে বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তিরা দর্শনের চর্চা করে এসেছেন সেখানে আজ সমাজবিজ্ঞান রূপে দর্শনের চর্চার প্রয়োজনীয়তা কিংবা মূল্য নিয়েই সংশয় দেখা দিয়েছে। এর কারন হল মানুষের মূল্য সম্পর্কে এক অদ্ভুত ধারনা। মানুষ আজ তাকেই মূল্যবান বলে মনে করে যা চটজলদী তার হাতের কাছে সমস্ত ভোগ্যপন্য এনে দিতে পারে। যা মানুষকে বিত্তবান করে তোলে, কিংবা জাগতিক সমস্ত ইচ্ছা অনায়াসে পূর্ণ করতে পারে কেবল তারই মূল্য রয়েছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রযুক্তি বিদ্যাকেই (Technological Education) অধিক মূল্যবান বলে মনেকরা হয়। কেননা এই সব বিষয়ে শিক্ষিত হলে অতি সহজেই বিষয় সম্পত্তিবান হয়ে ওঠা কিংবা অচিরেই সমাজে প্রতিপত্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরূপে পরিগনিত হওয়া যায়। বর্তমানে মূল্য (Value) কে অনেকটা লাভ লোকসান কিংবা অর্থ দিয়ে মাপা হয়ে থাকে এমত পরিলক্ষিত হয়। সমস্ত কিছুর ওপরে আজকের সমাজ অর্থকেই মূল্য দেয়। তাই যা মানুষকে কম সময়ে অনেক অর্থ এনে দিতে পারে মানুষ তাকেই মূল্যবান বলে মনে করে। অর্থই একমাত্র কাম্য কেননা তা মানুষের সমস্ত ইচ্ছা পূরন করতে পারে কিন্তু জীবনে যদি শুধু অর্থ উপার্জনই শেখা যায় সেই অর্থের যথাযথভাবে ব্যবহার অর্থাৎ জীবনের কাম্যতা ধর্মী সার্বিক বিকাশের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার না জানা

বর্তমান সমাজে ন্যায়বিচার

প্রাণ কুমার রজক
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ
মহিলা মহাবিদ্যালয়

সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচে না, ঠিক যেমন জল ছাড়া মাছ বাঁচে না। কারণ মানুষ সামাজিক জীব। মানুষ একাকী জীবন যাপন করতে পারে না, অন্যের সহযোগিতা, সহানুভূতি, সাহচর্য একান্তই প্রয়োজন। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীবের মত মানুষ সামাজিক জীব হিসাবেও পরিচিত। মানুষের জন্ম-মৃত্যু, ভালো-মন্দ, কাজকর্ম, বসবাস - সবকিছুই সমাজের মধ্যেই। আমরা সকলেই, এমনকি আদিম অবস্থার মানুষও কোন-না-কোন সমাজের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং সমাজকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না, সমাজ বাদ দিয়ে আমরা অচল। অ্যারিস্টটল বলেছেন - 'সমাজ ব্যতীত মানুষ হয় পশু না হয় দেবতা।'[১]

সমাজ বলতে আমরা বুঝি - 'কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বহু লোকের সংঘবদ্ধ বসবাস। সমাজ হল এমন এক বৃহত্তর সংঘবদ্ধ মানবগোষ্ঠী - যে মানবগোষ্ঠী মোটামুটি একটি স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে কোন সাধারণ উদ্দেশ্য বা স্বার্থ সাধনের নিমিত্ত পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্পর্কের ভিত্তিতে সমবেত ভাবে কাজ করে।'[২] সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকআইভার ও পেজ বলেন - 'সমাজ হল বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্কের একটি জটিল জাল।'[৩] জিসবার্ট যথার্থই বলেছেন - 'সামাজিকতা বা সমাজ হল মুখ্যতঃ একটি মানসিক অবস্থা।'[৪]

সমাজ হল মানুষের কাছে অপরিহার্য। সমাজ ছাড়া ব্যক্তির নিজস্বতা বলে কিছু নেই। ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবিকা-নির্বাহ, নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার ও সাম্য - সবকিছুই সমাজ সাপেক্ষ। একমাত্র সমাজে বাস করলেই এই সমস্ত বিষয় গুলি দাবী করতে পারি কারণ এ হল ব্যক্তির অধিকার। সমাজে বসবাস না করলে সমাজের কোন বিষয়েই ব্যক্তির কোন দাবী নেই, অধিকার নেই, কর্তব্যও নেই। সতরাং ন্যায়বিচারেরও কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বর্ধমান জেলার লৌকিক দেব-দেবী : ইতিহাস ও সংস্কৃতির আলোকে একটি পর্যবেক্ষন

রাজেশ্বর রায়
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
এম ইউ সি মহিলা মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার :

রাঢ়বঙ্গের কেন্দ্রমণি ও প্রান কেন্দ্র হল বর্ধমান। প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যমন্ডিত বর্ধমানের সংস্কৃতি যথেষ্ঠ উন্নত। বর্ধমানের লোক সংস্কৃতি, গ্রামীন সংস্কৃতি ও নগর সংস্কৃতি -এই তিন ধরনের সংস্কৃতিই দেখা যায়। আর এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবী তথা শিব ঠাকুর, ধর্মরাজ ঠাকুর, পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দ ঠাকুর, মনসা, চন্ডী, যোগাদ্যা , লৌকিক দূর্গা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে। এই সমস্ত লৌকিকদেব-দেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, মেলা, মোচ্ছব, প্রভৃতি। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে জনগন সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে একাত্ম হয়ে যায় এবং সাময়িক অবসাদ কাটিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

মূলশব্দ : রাঢ়বঙ্গ, লৌকিক দেব-দেবী, গ্রামীন সংস্কৃতি, লোকদেবতা, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন।

বর্ধমান জেলার ভৌগোলিক পরিচয় :

রাঢ়বঙ্গের বৃহত্তম ইতিহাস ধন্য জেলা হল বর্ধমান । জৈন তীর্থঙ্করের মহাবীরের পদধূলিতে ধন্য , মুঘলযুগের বিখ্যাত রাজমহিয়সী নুরজাজাহানের পতির(স্বামী) ঘর ছিল এই বর্ধমান, যা শের-আফগানের সমাধি আজো তাঁর ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে । 'বর্ধমান-ভূক্তি' প্রতিপাদ্যটি বিধৃত হয়েছে বিভিন্ন লেখতে(মল্লরসুল লিপি)তাম্রলিপিতে (নৈহাটি তাম্রলিপি),এবং ঐতিহাসিকদের[১] লেখনীতে। নদী বিধৌত বর্ধমান জেলা বর্তমানে আয়তনে ও আকারে প্রথম স্থানের অধিকারী । ভৌগোলিকরা জানিয়েছেন, বর্ধমান জেলার অবস্থান ২২৫৬-২৩৫৩ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৬৪৮-৮৮২৫ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। এই জেলার প্রাকৃতিক সীমানার উত্তরে অজয় নদী, দক্ষিণে দামোদর ও দ্বারকেশ্বর নদ এবং পশ্চিমে বরাকর নদ । বর্ধমান জেলার উত্তরে রয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ; দক্ষিণে হুগলী ও বাঁকুড়া জেলা ; পূর্বে নদীয়া এবং পশ্চিমে পুরুলিয়া ও ঝাড়খন্ড রাজ্য । এই জেলার আয়তন ৭০২৪.৪৩ বর্গ কি.মি. এবং মোট ৭০ লক্ষ লোকের বাস। ২০১১ সালের লোকগননা অনুযায়ী এই জেলার প্রায় ৬৩ শতাংশ লোক গ্রামের বাসিন্দা । সুতরাং অধিকাংশ লোক

রাজ আমলে কোচবিহারের চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিহাস চর্চা (১৯১৩ - ২২)

জয়দীপ পাল
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
সুকান্ত মহাবিদ্যালয়

চিকিৎসা ব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনাকালে প্রথমেই বলা প্রয়োজন ঔপনিবেশিক শাসনকালে এবিষয়ে নিত্য নতুন ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছিল । শুধু ঔপনিবেশিক শাসনকালেই নয় সুদীর্ঘকাল থেকেই ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্র গুরুত্ব পেয়েছে । প্রাচীনকালে বিশেষত গুপ্তযুগ থেকেই ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞান বিকাশ পেতে শুরু করেছিল । সময়ের সাথে সাথে তা পরিপূর্ণতা পেতে শুরু করেছিল । ঔপনিবেশিক শাসনকালে চিকিৎসা বিজ্ঞান ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । কারণ এদেশে ইউরোপীয় চিকিৎসক এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের আগমন ঘটেছিল মশলা ব্যবসার সূত্রে ।রোমান শাসকদের সময় থেকে ইউরোপে ভারতীয় মশলার বিশেষ চাহিদা।[১] জাহাজে করে যেসব মশলা ইউরোপে নিয়ে যাওয়া হত সেগুলি অনেকাংশে ব্যবহার করা হত ঔষধ নির্মাণে । ষোড়শ শতকের দিকে ইউরোপীয়রাই প্রথম ভারতের চিকিৎসা ব্যাবস্থা নিয়ে লিখেছিলেন ।এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে এদেশের রোগ নিয়ে সপ্তম শতকে পশ্চিম উপকূলে আরব বাণিজ্যের সূত্রে নানা চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য ভারতে এসে পৌঁছেছিল । বলাবাহুল্য এদেশে রোগ নিয়ে প্রথম মুদ্রিত পুস্তকের সূচনা হয়েছিল ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ।ভারতে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে ব্রিটিশ সরকার স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতীয় আবহাওয়ায় টিকে থাকার জন্য প্রয়োজন সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রচলন । অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফরাসিদের পরাজিত করে একটি শক্তিশালী বাণিজ্যিক কোম্পানীতে পরিণত হয় । বিস্তীর্ণ এলাকায় শাসন ক্ষমতা রক্ষার্থে নিযুক্ত হন কর্মচারীবৃন্দ ।[২] কোম্পানি নিজ কর্মচারীদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করেছিল । এরপর উনবিংশ শতকে নিত্য নতুন প্রযুক্তির সংযোগ ঘটেছিল । যার সুফল হিসেবে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার মেডিক্যাল স্কুল থেকে ভারতের প্রথম ডাক্তার পাশ করে বের হন ।[৩] এরপর ১৯১২ - ১৭ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মেডিক্যাল কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । এছাড়া ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতায় মেডিক্যাল অ্যান্ড ফিসিক্যাল সোসাইটি অফ্ ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্দোগে ।১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে হিন্দুস্তানি ভাষায় প্রচলিত চিকিৎসা শংক্রান্ত ক্লাস আগ্রা ও লাহোরে স্থানান্তরিত হয় ।এরপর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে লখনৌতে প্রতিষ্ঠিত হয় মেডিক্যাল কলেজ । যাহোক সমগ্র ভারতে সেসময়ে যে উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তার ঢেউ রাজন্য শাসিত কোচবিহারেও স্পর্শ করেছিল । কোচবিহারে আদিকাল থেকেই

নারী শিক্ষায় অগ্রনী নারী: প্রসঙ্গত: ঔপনিবেশিক জলপাইগুড়ি জেলা

সুব্রত বাড়ই
সহ-শিক্ষক
ইতিহাস বিভাগ
পূর্ব মল্লিকপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়

'আমি চিত্রাঙ্গদা,দেবী নই
নহি আমি সামান্য নারী'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলা এক আশ্চর্য ভূখন্ড। প্রচীনতায়, আর্থ সামাজিক বিভিন্নতায়, নৃতাত্বিক ও ভাবগত সংমিশ্রনের ফলে জেলা এক বৈচিত্র্যময় রূপ ধারন করেছে। তাই জলপাইগুড়ি শুধু চা, কমলালেবুর দেশ নয়, শুধু হাতি ও গন্ডারের দেশও নয়, শিক্ষা- সংস্কৃতির জগতেও এই জেলা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। জেলার জন্মলগ্ন থেকেই বহু উদ্যমী ও শিক্ষাব্রতী মানুষের নাম পাওয়া যায়, যারা শিক্ষার প্রকৃত বাতাবরন গড়ে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন।[১] জেলার বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনে ও শিক্ষাপ্রসারে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যে শ্রম, মেধা ও অর্থনৈতিক সহায়তা দান করেছিলেন তা অতুলনীয়। ঔপনিবেশিক বৃহৎবঙ্গে শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া জেলা ছিল জলপাইগুড়ি। এর মধ্যে অনেক শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব সার্বিক শিক্ষার পাশাপাশি নারী শিক্ষার ব্যাপারেও বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। তবে জেলার নারী শিক্ষার প্রসারে নারীদের অবদান খুব একটা চোখে পড়ে না। বর্তমান প্রবন্ধে জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষা প্রসারে, বিশেষকরে নারী শিক্ষা প্রসারে যেসকল নারী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করা হবে।

বর্তমান কালেও শিক্ষা ও কর্মনিযুক্তির দিক থেকে এই জেলার নারীরা পিছিয়ে রয়েছে। জেলার আনাচে কানাচে মধ্যযুগীয় নানা অপঘাতের সজীবতা কখনও কখনও লক্ষ্য করা যায়। জেলার অনেক স্থানেই এখনও পনপ্রথা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির স্বীকার হতে হয় নারীদের। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নারী জাতির অবর্ণীয় দুর্দশার কারন হিসেবে বিবেকানন্দ অশিক্ষাকেই নির্দেশ করেছেন। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য নারীদের অসীম কর্ম ক্ষমতা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন,''ইহারা স্বাক্ষ্যৎ জগদম্বা, এই রকম মা জগদম্বা যদি এক হাজার আমাদের দেশে তৈয়ার করিতে পারি, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া মরিব''।[২]অষ্টাদশ শতাব্দিতে ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসকরাই প্রথমে নারী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৮১৮ সালে রবার্ট মে সাহেবের

বাংলা পুথিসাহিত্যে কাল-জ্ঞাপক হেঁয়ালি

ডঃ সীমান্ত চৌধুরী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে, এই সময়ের পুথিগুলিতে মূল লেখকেরা পুথির লিপিকাল সাধারণত পুষ্পিকা অংশে লিপিবদ্ধ করতেন। অনেক ক্ষেত্রে পুথির নকলকার বা লিপিকারগণও মূল পুথির লিপিকাল উল্লেখ করে নিজের পুথি-নকলের সময়কাল লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই কালপরিচয়জ্ঞাপনের সময় কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খানিকটা হেঁয়ালির আশ্রয় নিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রচনারকাল নির্দেশে সুস্পষ্ট সন তারিখের উল্লেখ আছে, যেমন মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে। এই পুথিতে স্পষ্ট সাল তারিখের ভণিতা ব্যবহার করে লেখা হয়েছে -

''তেরশ পচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন।।''

অর্থাৎ কবি ১৩৯৫ শকাব্দে (১৪৭৩ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থ রচনা শুরু করেন এবং ১৪০২ শকে (১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে) গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। কিন্তু এই সুস্পষ্ট কালজ্ঞাপক শ্লোক মোটেই সুলভ নয় বরং ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখক বা লিপিকারেরা হেঁয়ালির মাধ্যমেই পুথির কাল নির্দেশ করেছেন আর এই পদ্ধতির এতটাই আধিক্য যে এই ধারণা করা অস্বাভাবিক নয় যে এই হেঁয়ালির রীতিই ছিল মধ্যযুগের সাধারণ প্রথা। যদিও বাংলা সাহিত্যের আদি যুগে বা মধ্যযুগের প্রথম পর্যায়ে এই রকম কালজ্ঞাপক রীতির উদাহরণ পাওয়া যায় না। চর্যাপদ বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এ এমন শ্লোক নেই। মধ্যযুগের কবিরা কোথা থেকে এই আদর্শ গ্রহণ করেছেন তা সুস্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয় তবে প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে ও খনার বচনে বার-তিথির উল্লেখ করবার ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাংকেতিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মধ্যযুগের কবিরা সেখান থেকেও এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন। এই বিশেষ কালজ্ঞাপনের বিষয়ে গবেষক বলেন - ''প্রাচীনকালে পুথিপত্রে শিলালিপি বা মন্দিরগাত্রে নানাভাবে সময়জ্ঞাপন করা হয়েছে। সে সব কালজ্ঞাপন করার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি এদেশে চালু ছিল। সরাসরি সংখ্যা না লিখে রহস্য করে পুথিপত্রের লিপিকাল কিংবা মন্দির প্রতিষ্ঠার কাল বলা হত। এই পদ্ধতি ধীরে ধীরে বেশ জনপ্রিয় হয়। সংখ্যার বদলে শব্দের কোন স্থিরতা ছিল না। ফলে ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো হত। হয়ত লিপিকররা লেখাকে পন্ডিত ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ পরীক্ষা করে নেবার প্রয়াস পেতেন এখানে। কালরহস্য

বিরলতম উপজাতি : টোটো

জন্মেঞ্জয় রায়
ছত্রপতি সাউ জি মহারাজ বিশ্ববিদ্যালয়
উজ্জ্বল মোদক
সহকারী অধ্যাপক
ইউনিভারসিটি বিটি অ্যান্ড ইভিনিং কলেজ

সংক্ষিপ্তসার :- পৃথিবীর বিরলতম উপজাতির মধ্যে 'টোটো' অন্যতম। টোটোরা পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের সন্নিকটে ভূটান সীমান্তে বসবাস করে যাচ্ছে। এরা মঙ্গলীয় জাতীর ইন্দো-ভূটানীজ উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত। এদের ভাষা বার্মা গোষ্ঠীর অন্তর্গত। টোটোরা নিজদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দেন। সমগোত্রীয় বিবাহ এদের নিষিদ্ধ। প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রধান মিলেট। টোটোরা গ্রাম্যজীবনযাপন করেন। এদের বাসগৃহগুলি মাটির উপরে মাচা করে তৈরী। সরকারী প্রচেষ্টাই পারে বিরলতম টোটো জাতিকে রক্ষা করতে।

সূচনা :- পৃথিবীর বিরলতম উপজাতিদের মধ্যে ভারতের ক্ষুদ্রতম জনগোষ্ঠী 'টোটো' অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের নবীনতম জেলা আলিপুর দুয়ারের উত্তরপ্রান্তে তোর্ষানদীর ধারে 'টোটো পাড়া' নামক গ্রামে এরা বসবাস করে। 'টোটো' উপজাতির মানুষেরা এই গ্রাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্যকোন প্রান্তে বসবাস করে না। এদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবন যাত্রা প্রণালি ভিন্নধর্মী পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন উপজাতিদের থেকে।

টোটোপাড়ার অবস্থান বিস্তৃতি :- টোটোদের একমাত্র বাসস্থান টোটো পাড়া গ্রামটি মাত্র ২০০ একর পরিসীমার মধ্যে বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলার জলদাপাড়ার অভয়ারণ্যের সন্নিকটে অর্থাৎ ভূটান সীমান্তের তাদিং পাহাড়ের ঢালে এই গ্রামটি অবস্থিত। পাহাড়ে ঘেরা গ্রামটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতীব মনোরম প্রকৃতির।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন যাত্রা ঃ- টোটোদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা পাশ্ববর্তী রাজবংশী, কোচ্ মেচ্-দের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির।

- **জাতিগত উৎস :-** টোটোরা মঙ্গোলীয় জাতীর ইন্দো-ভূটানিজ উপজাতি সম্প্রদায়ের। এদের চ্যাপ্টা নাক, ছোট চোখ, চৌকাকার গাল ও পুরু ঠোঁট হয়। এরা দীর্ঘকাল যাবৎ এই স্থানে বসবাস করে আসছে।

ডুয়ার্সে খ্রীষ্টান ধর্ম বিস্তারের সামাজিক প্রেক্ষাপট

কৌশিক চক্রবর্ত্তী

জাতি-উপজাতি, ধর্ম-বর্ন, ভাষা, সমাজ-সংস্কৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি একক স্থানে বৈচিত্রময় অবয়ব এর সন্ধান পেতে হয় , তবে নিঃসন্দেহে এই ডুয়ার্স অন্যতম উদাহরণ । এখানে ধর্ম ও ধর্মাবলম্বী মানুষের ভিন্নতাও দেখা যায় । হিন্দু-মুসলিম- খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ-জৈন প্রায় সব ধর্মের মানুষই একত্রে বাস করে । আমি এখানে খ্রীষ্টানধর্ম প্রচার ও প্রসার , সর্বোপরি কোন কোন জাতি বেশি পরিমানে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করব । অর্থাৎ ডুয়ার্সে খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়া জাতি ও উপজাতিদের সামাজিক প্রক্ষাপট নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব । বিশেষতঃ চা-বলয় এবং চা-বাগিচা কে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার ও প্রসার দেখা গিয়েছিল । এই ধর্ম এখানে প্রসারের আগে এখানে যে সমাজ ব্যাবস্থা ছিল সেই ইতিহাস একটু তুলে ধরা প্রয়োজন । কারন খ্রীষ্টান ধর্ম ব্রিটিশ আশ্রিত পাদ্রীদের হাত ধরে এ অঞ্চলে বিস্তার পায় এবং ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক উপনিবেশ ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ডুয়ার্সে সমান্তরাল ভাবে বিস্তার লাভ করে । ব্রিটিশ আশ্রিত বা ইউরোপীয় পাদ্রীরা ঔপনিবেষিক শাসকদের সহায়তায় ডুয়ার্সে তথা সারা ভারতে ধর্মপ্রচারের সুযোগ পেয়েছিল । ১৮৬৪ এর দ্বিতীয় ইঙ্গ-ভুটান যুদ্ধের পর ডুয়ার্স ইংরেজদের অধীনে চলে আসে । ঔপনিবেষিক অর্থনীতির দরুন ব্রিটিশ সরকার The Bhutan-Dooars Act, 1869 আইন পাস করে[১] ডুয়ার্সের বনসম্পদ ও জমি সম্পূর্নরূপে পতিত ও ঘাসজমি রূপে চিহ্নিত করা হয় । এই ভাবে ডুয়ার্সে ব্রিটিশ উপনিবেষ তৈরী হয় । ব্রিটিশ উপনিবেশিক স্বার্থে এরপর চা-বাগিচা গুলির পত্তন করা হয় । চা-বাগিচা গুলির পত্তনের ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ন অধ্যায় । কারন চা-শ্রমিক ও বন বসতি অধ্যুষিত এলাকাতেই এই খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচার দেখা যায় এবং এই স্থানের বেশি পরিমানে উপজাতিরা প্রধানত খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহন করেছিল । ব্রিটিশ অধিকৃত এই ডুয়ার্সের চা-বাগিচা শ্রমিক , বন-বাসী এবং কৃষি-জীব নির্ভর প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগনের মধ্য খ্রীষ্টান মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের কাজ শুরু করেছিল । এক্ষেত্রে চা-বাগিচার পত্তন এবং মধ্য-দেশীয় উপজাতি শ্রমিক সম্পদায়কে ডুয়ার্সে আনয়নের ইতিহাস ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায় ।

Eastern Dooars বা Western Dooars তথা সমগ্র ডুয়ার্স চা অর্থনীতির ক্ষেত্রে বড়ো ভূমিকা পালন করে এবং এর ভবিষৎ বিটিশরা অতীতেই নির্ধারন করে গিয়েছিল ।

ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতকের কোচবিহারের সভা সাহিত্য ঃ কোচবিহার রাজ পন্ডিতগন

রুম্পা দাস
শিক্ষিকা
শিকারপুর হাইস্কুল

কোচবিহার রাজ্যে কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহারাজ বিশ্বসিংহ । নসরৎ শাহের রাজত্বকালে কোচবংশীয় বিশ্বসিংহ তুর্কীদের পরাজিত করে এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । তুর্কী শাসনের আগে কামতা কোচবিহার ছিল খেন বংশের অধীনে , তার আগেও কামতাপুরে অন্যান্য রাজবংশের ইতিহাস আছে । কিন্তু অন্যকোন রাজবংশ কোচ রাজবংশের মত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । পঞ্চদশ শতকের শেষ দিক থেকেই স্থানীয় কোচ জাতিরা শক্তি সংগ্রহ করে গোয়ালপাড়ার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে । কোচ জাতির নেতা বিশ্বসিংহ ক্ষমতা অর্জন করে অবশেষে ১৫২২ খ্রীঃ নসরৎশাহের রাজত্বকালে কামতা অধিকার করে এবং অচীরেই রাজ্যবিস্তার করে কামতেশ্বর উপাধি গ্রহন করে সিংহাসনে আসীন হন । সেই সময় থেকেই (১৫২২ খ্রীঃ) সভা সাহিত্য বিকাশ লাভ করতে শুরু করে ।

কোচ শাসনাধীন কামতার সাহিত্যের প্রধান ধারাটি ছিল মূলতঃ অনুবান সাহিত্য । তাই এ সময়ে যাঁরা সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন , তারা সকলেই একাধারে সংস্কৃত ভাষায় সুপন্ডিত ও বিচক্ষনতার অধিকারী ছিলেন । তাই জনসাধারনের প্রতি সংস্কৃত সাহিত্যের রসোপলব্ধির জন্য তথা তা বিস্তারের অভিলাষে তাঁরা রামায়ন , মহাভারত ও পুরাণাদি শাস্ত্রানুবাদে ব্রতী হয়েছিলেন । তবে কামতা-কোচবিহার রাজসভায় প্রধানত পুরান চর্চার আধিক্য লক্ষ করা যায় । প্রায় সব রাজারাই রামায়ন, মহাভারত অনুবাদে সভাকবিদের বিশেষ উৎসাহিত করেছিলেন । সংস্কৃত রস সাহিত্যের অনুশীলন এবং পুরাণাদির অনুবাদই হল এখানকার মুখ্য সাহিত্যকর্ম । তবে মহারাজা বিশ্বসিংহের রাজত্বকালের পূর্বে দুর্লভ নারায়নের রাজত্বকালেই কোচরাজ্যের সভা সাহিত্যে প্রাথমিক রূপে সূচনা হয়েছিল । প্রায় চতুর্দশ শতকের শেষ সময়ে এখানে সভাকবি রূপে তিনজন পন্ডিত ছিলেন , যথা -[১]

১) কবি হেম সরস্বতী 'প্রহ্লাদ চরিত' এবং 'হরগৌরী সংবাদ'- এর অনুবাদক ছিলেন ।
২) হরিহর বিপ্রঃ তিনি মহাভরতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেছিলেন । এবং
৩) কবিরত্ন , যিনি মহাভারতের দ্রোনপর্বের অনুবাদক ছিলেন ।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ঃ 'টোপ' 'জান্তব' 'বন-জোৎস্না'

ডঃ সুলেখা পন্ডিত
অধ্যাপিকা
বাংলা বিভাগ
তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় ছোট গল্প রচনার এক শক্তিশালী শিল্পী । যদিও বঙ্গ সাহিত্যের সব কটি শাখাতেই তাঁর অনায়াস বিচরন । খ্যাতিসম্পন্ন এই অধ্যপক, সমলোচক ও সাংবাদিক হিসেবেও সফল । লেখকের আদি নিবাস বরিশাল হলেও জন্ম দিনাজপুর জেলার বালিয়াডাঙ্গিতে । অবিভক্ত বাঙলাদেশের ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট , অরন্য ভূ-ভাগ, জনজীবন তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের ভিত্তিভূমি । অতি অল্প সময়ে একাধিক উপন্যাসের স্রষ্টা নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পী মানসে প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানব-প্রকৃত ও প্রবৃত্তি, ইতিহাস চেতনা, রাজনৈতিক প্রেক্ষন অজস্র দিক্ সন্ধানী আলোক ক্ষেপনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে । তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে আলোচনার প্রারম্ভেই শ্রী শ্রীকুমার বন্ধোপাধ্যায় লিখেছেন - " বাংলা দেশের দীর্ঘ প্রসারিত, বৈচিত্র্যহীন সমভূমির প্রান্তভাগে যেমন একটি পার্বত্য বন্ধুরতা ও আরন্য দুর্ভেদ্যতার প্রাচীর বেষ্টনী আছে , তেমনি তাহার শান্ত, নিস্তরঙ্গ জীবন-যাত্রার সুদূর পশ্চাৎপটে একটা অসংস্কৃত হৃদয়োচ্ছ্বাস ও বন্যা-দুর্বার আবেগের গভীর রেখাঙ্কিত সীমান্ত প্রদেশ আছে । ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আর্যজাতির সহিত তুলনায় বাঙলীর রক্তধারা ও চিত্তবৃত্তিতে আদিম অনার্য প্রভাবের বিচিত্রতর সংমিশ্রন সুপ্ত আছে । মনের অবচেতন স্তরে সংবৃত এই অতীত সংস্কার কখনও কখনও অতর্কিত তাহার রক্তে দোলা দেয় , তাহার জীবনের ধূসরতার মধ্যে এই রক্তরোয়া কোন কোন মুহূর্তে ঝিলিক দিয়া উঠে । বাঙালী জীবনের এই প্রখর রাগদীপ্ত প্রত্যন্ত প্রদেশ আধুনিক খুদের যে সমস্ত ঔপন্যাসিকের তীব্র কৌতূহল ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়াছে তাহাদের মধ্যে নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও শ্রেষ্ঠতম ।"

উপরিউক্ত কথাগুলো নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প সম্পর্কেও খাটে । ছোটগল্পের আঙ্কিক নির্মানে সচেতন শিল্পী ও গবেষক নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায় ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, বিজ্ঞানের সাহায্যে জীবনের যে মর্ম গ্রহন করেছেন তাকেই উদ্ভাসিত করে তুলেছেন তাঁর ছোটগল্পের অঙ্গনে । মনোবিজ্ঞান ও বস্তুবিজ্ঞানের সাহায্যে সত্যের উৎস সন্ধানে নিরত এই শিল্পী মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে লোকান্তরিত না হলে বঙ্গ সাহিত্য আরো কিছু পেত তাঁর কাছ হতে । তাঁর ছোটগল্প গুলিতে আছে মানুষের মনের জগতের বিপুল বৈচিত্র্য আর উত্থান-পতন । বস্তু জগতের চির চলমান দ্বন্দ্ব মানুষের শ্রেনী চরিত্রে প্রকট হয়ে উঠেছে । জমিদারের কদর্য্য বিলাসিতা, ধনার, ধনমত্ততা, মহাজনের লোভ লোলুপতা, অসহায় নারীর

শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির আলোকে নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস অনুসন্ধান

সুজয় দেবনাথ
সহ অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
বক্সিরহাট মহাবিদ্যালয়

''দেশ দেশান্তর মাঝে যার যথা স্থান
খুজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান''

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

মিশ্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ভারতীয় সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই যোগ সাধনা প্রচলিত ছিল । হরপ্পা সভ্যতার যোগাশনে উপবিষ্ট মূর্তি সমূহের উপস্থিতী ইঙ্গিত বহন করে যে আর্যপূর্ব সময়কাল থেকেই ভারতে যোগ সাধনা প্রচলিত ছিল । পরবর্তী সময়ে যোগামার্গ দার্শনিক ও লৌকিক এই দুই ধারায় বিকশিত হবার ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যোগিনাথ সম্প্রদায় । প্রাথমিক পর্বে মূলত ব্রাহ্মন সন্যাসি পরিচালিত একটি ধর্ম সম্প্রদায় হিসাবে যাত্রা শুরু হলেও পরবর্ত্তী কালে এর সমন্বয়বাদী উদার আদর্শে বিভিন্ন বর্ন ও শ্রেনীর জনশ্রোত এসে এই ধারায় মিলিত হয় । বংশগত পরম্পরা এবং গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বিকশিত নাথ সম্প্রদায়কে নৃ-তাত্ত্বিক পরিভাষায় নির্দিষ্ট কোন স্বতন্ত্র নরগোষ্টির আঙিনকে বিচার করা যুক্তিসঙ্গত নয় । তবে ইতিহাসের গতিপ্রবাহে ঔপনিবেশিক পর্বে এবং তার কিঞ্চিৎ পূর্বকাল থেকে জাতিভেদ-বর্নভেদ প্রথায় অবিশ্বাসী 'নাথ' পদবীবীরি জনসমূহকে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে প্রতিপন্ন করে এক অমীমাংসীত জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে । নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস , দর্শন, সাধনপ্রনালী , সাহিত্য ও সস্কৃতি নিয়ে আধুনিক কালে গবেষনার সুত্রপাত করেন বি. এইচ. হডাসন. নামক ইংরেজ গবেষক এবং পন্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সেই পদাঙ্ক অনুসরন করেন । এর পরবর্তীকালে হ্যামিল্টন, ক্রুক, টেলবয়েজ হুইলার, ব্রিগস , তেসিতরি , জর্জ গ্রিয়ারসন, উইন্টারনিটজ, ডেভিড গর্ডন ফিল্ড, এডওয়ার্ড হেনরী , এডিয়ানো মুনোজ প্রমুখ বিদেশী গবেষক এবং গোলিনাথ কবিরাজ , শশীভূষন দাশগুপ্ত, অমূল্যচরন বিদ্যাভূষন, হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, পিতাম্বর দত্ত বরথওয়াল , ডঃ দোলগোবিন্দ শাস্ত্রী, ডঃ ক্যালানী মল্লিক, ডঃ প্রফুল্লচরন চক্রবর্তী , প্রভাস চন্দ্র বন্ধোপাধ্যায় , রাধাগোবিন্দ নাথ , রাজমোহন নাথ, সুরেশ চন্দ্র নাথ মজুমদার, ডঃ সুজন সারথী কর প্রমুখ ভারতীয় গবেষক এবিষয়ে আলোকপাত করেছেন । কিন্তু বেশীর ভাগ গবেষনাই সাহিত্যিক উপাদান নির্ভর এবং সন্যাসী বা পরিব্রাজক নাথ জনগোষ্টি কেন্দ্রিক ; গৃহী নাথ জনসমষ্টি এই সমস্ত গবেষনায় তেমনভাবে স্থান পায় নি । এই শূন্যস্থানপুরনেরত্র ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিলালিপি তাম্রশাসনাদির বিবরনের সঙ্গে